‘বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ এর “রাশিয়ার চিঠি” - এক অন্য সমাজের ভিন্নচিত্রঃ সুব্রতা রায়

আজ থেকে ৮৮ বছর পূর্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়ার চিঠি প্রবন্ধটি লিখেছেন। তাঁর লেখনীতে তিনি রাশিয়ার বর্ণনার পাশাপাশি ভারতবর্ষের কৃষক–শ্রমিক- সাধারণ মানুষের তুলনামুলক বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি কল্পনায় ভারতকে যে রকম দেখতে চেয়েছেন, রাশিয়ায় গিয়ে তার প্রয়োগ দেখতে পেয়েছেন, অভিভূত হয়েছেন, সাথে সাথে একটা আকুতি ছিল লক্ষ্য করবার মতো যা শান্তিনিকেতনে আংশিক ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। ১৯১৭ সালে জার শাসনামলে যে দেশটি ছিল দারিদ্র পীড়িত, শোচনীয় ও পিছিয়ে পড়া, মাত্র ১৩ বছরের ব্যবধানে বলশেভিকদের ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে পাওয়া নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিশাল কর্মযজ্ঞ আগাগোড়া সকল শ্রেণীর মানুষকেই কিভাবে সমান করে জাগিয়ে তুলেছে, ম্যাজিকের মতো পাল্টে দিতে পেরেছে- যা রাশিয়ার চিঠি পড়ে আন্দাজ করতে পারি।

১৯২৬ ও ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে কবিগুরুর ভিয়েনা ও জাপানে থাকাকালীন সময়ে রাশিয়া থেকে রাশিয়া ভ্রমণের নিমন্ত্রণ আসে। যেতে পারেননি শারীরিক কারণে। অবশেষে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে জেনেভায় অবস্থানকালে মস্কোর নিমন্ত্রণে ইংরেজ বন্ধুদের বাধা সত্ত্বেও কবিগুরু ১১ সেপ্টেম্বর মস্কো আসেন, ১৫ দিন অবস্থান করেন সেখানে।

কবি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ বার বার ভ্রমণ করেছিলেন। ঐসব দেশের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কীভাবে অর্থ সঞ্চয়ে ব্যস্ত ছিল এবং কীভাবে দিন দিন মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে তাদের মনুষ্যত্বকে গ্রাস করছিল তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। রাশিয়া অবলোকন করে কবি লিখেছেন-

এখানে এসে সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে, ধনগরিমার ইতরতার সম্পুর্ণ তিরোভাব। এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভূষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি।

এখন স্পষ্টভাবে বলা যায়- রবীন্দ্রনাথের মতো একজন মহামানব স্বচক্ষে রাশিয়া দেখার পর প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করলে সমগ্র বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহলে তার প্রভাব কতোখানি পড়বে-এখানেই ছিল ইংরেজ বন্ধুদের রবীন্দ্রনাথের প্রতি রাশিয়া ভ্রমণে

নিষেধের কারণ।

সমাজে কিছু লোকের মানুষ হবার সময় নেই, তারা কম খায়, কম শিখে, বেশী পরিশ্রম করে, অসম্মান, লাথি-ঝাঁটা খেয়ে অন্যের পরিচর্যা করে। অথচ এরাই সমাজের পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে-উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। এখানে তিনটে বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অধিক ব্যস্ত আছে, তা হল- শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। কবি দেখতে পেয়েছেন- সেখানে সকলেই স্বহস্তে নিজেদের কাজ- কর্ম করেন। নতুন সমাজ ব্যবস্থার কারণে ঘরে বাইরে প্রচন্ড বিরুদ্ধতার সাথে লড়ে চলতে হচ্ছে। অর্থ সম্বল সামান্য, কোনমতে পেটের ভাত বিক্রি করে চলছে রাশিয়ার উদ্যোগপর্ব। কাজ সামান্য নয়, ইউরোপ এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড রাষ্ট্রক্ষেত্র। তাদের ভূ-প্রকৃতি-মানব প্রকৃতির মাঝে পরস্পর পার্থক্য অনেকবেশী, সমস্যাও বিচিত্র। কিন্তু রাস্তায় যারা চলেছেন তারা একজনও শৌখিন নন, বাবুগিরির পালিশ কোন জায়গাতেই নেই, সাজে পরিচ্ছদে সবাই এক তবে এতে কারো কোন কুন্ঠা নেই- কেননা সকলেরই একদশা। এরা কঠিন পণ করেছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী সংকল্প সাধনে সকলেই দেশের জন্য মহৎ কর্মযজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

আমি প্রথমেই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। এখানে শিক্ষাকে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত করা হচ্ছে। সমাজের কোন মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিস্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্য শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার প্রবলতায়-সম্পূর্ণতায় লক্ষ্য করবার মতো। শিক্ষা শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্য নয়- মধ্য রাশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও চলছে সায়েন্সের শেষ আবিষ্কারের সুফল পর্যন্ত যাতে তারা পায়- এমনতর ব্যবস্থা। এখানকার শিক্ষার কাজ একেবারে সজীব প্রণালীতে। জীবনযাত্রার সাথে মিলিয়ে চলছে শিক্ষা ব্যবস্থা। পাশ করা, ভালো রেজাল্ট বা পণ্ডিতি করবার জন্য শেখায় না- সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্য শেখায়। যে কাজ তারা করছেন-

সকাল সাতটায় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তারপর পনের মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ। আটটার সময় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্য আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্যন্ত ক্লাস চলে। শেখবার বিষয় হচ্ছে- ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান,

সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বই-বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার।

শুক্রবার নেই- রবিবার নেই, প্রত্যেক ৫ম দিনে ছুটি। পড়ালেখার সাথে সাথে রুটিন অনুযায়ী- কারখানা, গ্রাম, হাসপাতাল ভ্রমণ, গল্পবলা, গল্প পড়া, তর্কসভা, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা, সিনেমা দেখা, থিয়েটার দেখা, নিজেরা অভিনয় করা, কাপড় কাচা, ঘর পরিস্কার করা, বাড়ির চারপাশ পরিস্কার করা- শিক্ষার অর্ন্তগত।

শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা চলছে। মানুষকে শিক্ষিত করে তুলবার জন্য শুধুমাত্র বিদ্যালয় নয়, মিউজিয়াম সহ নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে দেশ জুড়ে। সোভিয়েট রাশিয়ার একটি পার্কের ব্যবস্থাপনা কবি যেভাবে তুলে ধরেছেন-

পার্কের প্রধান ঘরটি প্রদর্শনীর জন্য। যেখানে ঐ প্রদেশের কারখানার শতসহস্র শ্রমিকদের জন্য কত ডিস্পেন্সারি খোলা হয়েছে, স্কুলের সংখ্যা কত বাড়লো, কতটা নতুন বাড়ি, বাগান, নতুন ও পুরোনো পাড়াগাঁর মডেল, ফুল, সবজী উৎপাদন, বিভিন্ন যন্ত্রের নমুনা, শহরের কত বিষয়ে কত রকমের উন্নতি হয়েছে, নানা তামাশা ইত্যাদি নানান তথ্য সন্নিবেশিত ব্যবস্থা। পার্কের একটি জায়গা শুধুমাত্র শিশুদের জন্য। যেখানে লেখা আছে

“শিশুদের উৎপাত কোরো না।”

আছে শিশুদের রাখবার জন্য শিশু রক্ষিয়ত্রী। মা-বাবা ধাত্রীদের কাছে সন্তানকে রেখে পার্কে ঘুরে বেড়ান। আছে লাইব্রেরী, খেলার ঘর, দেয়ালে ঝোলানো মানচিত্র, খবরের কাগজ। জনগণের খাবারের জন্য কো-অপারেটিভ দোকান আছে।

মানুষের সমাজে আজ বিজ্ঞানের জয়-জয়কার; কিন্তু সদ্য জন্ম নেয়া শিশুটিকে মানুষ করবার বাস্তব ব্যবস্থায় আমরা আজও আদিম। কিন্তু তৎকালীন সময়েই রাশিয়ায় শিশুদের সম্বন্ধে তাদের বিধান হোল- শিশু জারজ কিংবা বিবাহিত দম্পতির সন্তান সে সম্বন্ধে কোন পার্থক্য এরা গণ্যই করে না। আইন হল-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত লালন-পালনের ভার বাবা-মায়ের। বাড়িতে বাবা-মা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন কি-না তা তদারক করেন রাষ্ট্রের অভিভাবক বিভাগ। ১৬ বৎসর বয়সের পর খাটুনির কাজ করতে পারবে ৬ ঘন্টা অব্দি। অভিভাবক বিভাগ মাঝে মাঝে পরিবার পরিদর্শনে আসেন, স্বাস্থ্য ও পড়ালেখার প্রতি অযত্ন পরিলক্ষিত হলে ঐ সন্তানের দায়িত্ব সরকারী অভিভাবক বিভাগের ওপর পড়ে। তারা বিশ্বাস করেন সন্তান শুধু বাবা-মায়ের নয়, মুখ্যত সমস্ত সমাজের। সেখানে শিশু অপরাধের শাস্তি এরকম- যদি কেউ অপরাধ করে তাকে তার অপরাধ সম্পর্কে বলাবলি করা হয়। সে যদি অপরাধ করে তাহলে সে অপরাধী বলে

বিবেচিত হয়, আর এই অপরাধী হওয়াটাই তার শাস্তি। কারণ অপরাধী এতে দুঃখিত হয়- দুঃখ পায়।

৮৮ বছর পূর্বেই চাষীদের জন্য রাশিয়া যা করেছে –আমরা এখনো তা বাস্তবে তো নয়ই স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। জেনেছি, সেখানে চাষীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে চলছে বিশাল আয়োজন। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরছি-

মস্কোতে একটি কৃষিভবন দেখতে গিয়েছিলুম। এটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোটবড় শহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এ-সব জায়গায় কৃষিবিদ্যা সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায় করেছে, এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

চাষীরা গ্রাম থেকে শহরে এলে খুব কম খরচে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত এসব ভবনে থাকতে পারেন। কৃষিকে এগিয়ে নিতে সমবেত কৃষিক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে কবির লেখায় ঐকত্রিক বা সমবেত কৃষিক্ষেত্রের একজন চাষীর কথা-

আমাদের এই ক্ষেতে জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেক্টর। গত বছরে সেখানে তিনহাজার চাষী কাজ করতো। এ বছরে সংখ্যা কিছু কমে গেছে, কিন্তু ফসলের ফলন আগেকার চেয়ে বাড়বার কথা। কেননা, জমিতে বিজ্ঞানসম্মত সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইরকম লাঙল এখন আমাদের তিনশোর বেশী আছে। প্রতিদিন আমাদের আটঘন্টা কাজ করবার মেয়াদ। যারা তার বেশী কাজ করে তারা উপরি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় ক্ষেতের কাজের পরিমাণ কমে, তখন চাষীরা বাড়ি তৈরি, রাস্তা মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে শহরে চলে যায়। এই অনুপস্থিতির সময়ও তারা বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে আর তাদের পরিবারের লোক তাদের নির্দিষ্ট ঘরে বাস করতে পায়।

ঐ সময় জোর জবরদস্তি করে সকল কৃষককে সমবেত কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় আনতে হবে সে রকমটা ছিল না। আমরা জানতেই পারি একজন স্বতন্ত্র খেত মালিকের কথা-

আজও আমার নিজের স্বতন্ত্র খেত আছে, কিন্তু নিকটবর্তী ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আমি শীঘ্রই যোগ দেব। কেননা দেখেছি, স্বাতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রনালীতে ঢের ভাল

জাতের এবং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করা যায়। যেহেতু, প্রকৃষ্টভাবে চাষ করতে গেলেই যন্ত্র চাই, ছোট ক্ষেতের মালিকের পক্ষে যন্ত্র কেনা চলে না। তাছাড়া, আমাদের টুকরো জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার অসম্ভব।

১৯১৭ সালে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এ দেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চোখেও দেখেনি, তারা ছিল সম্পুর্ন নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বাক। অথচ সোভিয়েত সরকারের বহুব্যাপক কর্মসুচি একসময়ের নিরক্ষর চাষীদের নবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রশস্ততম ভিত্তি স্থাপন করেছে। নতুন সমাজ ব্যবস্থার সমবেত কৃষিক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা নারীদের সমান সুযোগ সৃস্টি করেছে। শিশু বিদ্যালয়ে শিশুদের দেখাশোনা ও শেখানোর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকায় নারীরা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন। সংসারের অশান্তি কমে গেছে বহুলাংশে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘের একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, শ্রমিকদের জন্য বাসা নির্মাণ যার প্রধান কর্তব্য। সোসাইটির নাম বিশ্রান্তিনিকেতন। তখন পর্যন্ত ৫টি বিশ্রান্তিনিকেতন ছিল যেখানে খাটুনির ঋতুকাল শেষ হয়ে গেলে অন্তত ত্রিশহাজার শ্রমক্লান্ত মানুষ বিশ্রাম করতে পারতো সেই ৫টি নিকেতনে। প্রত্যেক মানুষ ১৫ দিন এখানে থাকতে পারবেন। পর্যাপ্ত আহারের ব্যবস্থা, আরামের ব্যবস্থা, ডাক্তারের ব্যবস্থা সেখানে। এখনো অব্দি শ্রমিকদের জন্য এ ধরণের ব্যবস্থা বিরল- স্বপ্নের মতো।

সিভিল সার্ভিসের আমলাদের জন্য মোটা অংক খরচ করবার কাজ করছে না এরা। যারা যোগ্য, যারা বৈজ্ঞানিক তারা সবাই লেগে গেছে। কৃষি সম্বন্ধে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হলিস্টিক এ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে মাত্র ১৩/১৪ বছরেই রাশিয়াকে অনন্য এক দেশ বানিয়েছে বলশেভিক। বাংলাদেশও এরকম একটি স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীন হয়েছিল যা চারটি মুলনীতি- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সহজে অনুমেয়। কিন্তু ১৯৭৫ সাল পরবর্তী ঘটনা আমাদের বহুদূর পিছিয়ে দেয়। ৪৭ বছর হোল- আজও আমরা ভূতের মতো পেছনে হাঁটছি। তারুণ্য আমার কাছে সৃষ্টির প্রতীক, সাহসের প্রতীক, ন্যায্যের প্রতীক। তাদের প্রতি আহবান আপনারা দেশটাকে এগিয়ে নেবার পরিকল্পনা করুন। রবীন্দ্রনাথের মর্মবাণী আমাদের সকলের হৃদয়ে জাগ্রত হোক।